الإسرائيليات

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কিতাব থেকে কিছু বর্ণনা করার বিধিবিধান।



মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, খুলনা।

আল-ইসরাঈলিয়াত (الإسرائيليات)

ইহুদি ও নাসারাদের কিতাব থেকে বর্ণনা করার বিধিবিধান

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, খুলনা।

আমরা ওয়াজের ময়দান ও আমাদের সমাজে নবীদের নামে কিংবা পূর্ববর্তীদের সূত্রে এমন অনেক ঘটনা শুনি, যা আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কোন ঘটনা গ্রহণ করা যাবে আর কোনটি গ্রহণ করা যাবে না? এ ব্যাপারে শরিয়তে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু আমরা অনেক সময় সেসব জানি না। শুধু বলি, অমুক বলেছেন কিংবা অমুক কিতাবে আছে—ব্যস, সেটিই বর্ণনা করে দিই। অথচ এমন অনেক কথা রয়েছে, যা ইসলামের নামে প্রচার করা জায়েজ নয়। আসুন, তাহলে আমরা বিষয়টি জেনে নিই।

আমরা কয়েকটি ধাপে আলোচনা করব—

১। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলতে কী বোঝায়?

২। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত কত প্রকার?

৩। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করার হুকুম কী?

৪। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান কী হওয়া উচিত?

প্রথম আলোচনা

ইসরাঈলিয়াতের পরিচয়

‘ইসরাঈলিয়াত’ (الإسرائيليات) শব্দটি ‘ইসরাঈলিয়্যাহ’ (إسرائيلية)-এর বহুবচন। ‘ইসরাঈল’ মূলত ইয়াকুব (আ.)-এর একটি নাম। তাঁর আরেক নাম ইসরাঈল। তাঁর বংশধরদের ‘বনি ইসরাঈল’ বলা হয় এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়কে ‘ইসরাঈলী’ বলা হয়।

ইসলামী পরিভাষায়, আহলে কিতাব—অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল অথবা পূর্ববর্তী নবীদের কিতাব থেকে বর্ণিত কোনো কথা বা ঘটনাকে ইসরাঈলিয়াত বলা হয়।

শুধু তা-ই নয়; তাদের পাদ্রি ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের বক্তব্য এবং রোমান, পারস্যবাসীসহ অন্যান্য জাতির ধর্মীয় কিসসা-কাহিনিকেও ইসরাঈলিয়াত বলা হয়।

তবে সাধারণত এসব ঘটনা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকেই বেশি বর্ণিত হয়েছে বলে তাদের দিকেই এ শব্দটি সম্পৃক্ত করা হয়।

এক কথায়, পূর্ববর্তী কোনো সূত্র থেকে বর্ণিত এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত নয়—এমন ঘটনাকে পরিভাষায় ইসরাঈলিয়াত বলা হয়। (১)

দ্বিতীয় আলোচনা

ইসরাঈলিয়াতের প্রকারভেদ

কেউ কেউ ইসরাঈলিয়াতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে আমার মতে, বিষয়টি জানা ও বোঝার সুবিধার্থে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করাই অধিক উপযোগী। যেমন—

ক. বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে।

খ. আমাদের দীনের অনুকূল বা সাংঘর্ষিক হওয়ার ভিত্তিতে।

প্রথম প্রকার

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইসরাঈলিয়াত তিন প্রকার—

১। আকিদাগত

২। ফিকহ বা শরিয়তের বিধানসংক্রান্ত

৩। ঘটনা, ইতিহাস, সংখ্যা, নাম ইত্যাদি বিষয়ক।

১. আকিদাগত বিষয়

আকিদাগত বিষয়ের একটি উদাহরণ হলো—

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِيْنَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ)

অনুবাদ:

আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদি আলিমদের একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ‘হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে দেখতে পাই যে, আল্লাহ আকাশসমূহকে এক আঙুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে এক আঙুলের ওপর, পানি ও মাটি এক আঙুলের ওপর এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে এক আঙুলের ওপর স্থাপন করবেন। এরপর বলবেন, আমিই বাদশাহ।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা সমর্থন করে হাসলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশিত হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন—

“তারা আল্লাহকে তাঁর যথোচিত মর্যাদা দেয়নি।” (২)

২. শরিয়তের আহকামের দিক থেকে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوْا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوْا لَا نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ (فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَآ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ) فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِيْ يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُوْنَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوْا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِيْ عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

অনুবাদ:

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, এক পুরুষ ও এক নারী ব্যভিচার করার পর ইয়াহুদিরা তাদেরকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলো। নবী ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যভিচার করলে তোমরা তার সঙ্গে কী আচরণ কর?’

তারা বলল, ‘আমরা তাদের দুজনের মুখ কালিমালিপ্ত করি এবং তাদের প্রহার করি।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা কি তাওরাতে রজমের বিধান পাও না?’

তারা বলল, ‘আমরা তাতে এ বিষয়ে কিছুই পাই না।’

তখন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) তাদের বললেন, ‘তোমরা মিথ্যা বলছ। তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর।’

এরপর তাদের যে ব্যক্তি তাওরাত শিক্ষা দিত, সে রজমের আয়াতের ওপর নিজের হাত রেখে তার আগে ও পরের অংশ পড়তে লাগল; কিন্তু রজমের আয়াতটি পড়ছিল না।

তখন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) তার হাতটি রজমের আয়াতের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এটি কী?’

তারা যখন বিষয়টি দেখল, তখন বলল, ‘এটি রজমের আয়াত।’

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দিলেন। মসজিদের পাশে জানাজার স্থানের নিকটে তাদের রজম করা হলো।

ইবনু উমার (রা.) বলেন, ‘আমি সেই পুরুষটিকে দেখলাম, সে তার সঙ্গিনীর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।’ (৩)

৩. ইতিহাস, ঘটনা, ওয়াজ, যুহদ ইত্যাদি বিষয়ে

আমরা যদি সাহাবি, তাবেঈ ও ইমামদের কিতাব অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখতে পাব—ইতিহাস, ঘটনা, যুহদ, রিকাক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের গ্রন্থগুলোতে আহলে কিতাব থেকে বর্ণিত অনেক তথ্য রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, তাফসিরে তাবারি, তাফসিরে ইবনু কাসির, কিতাবুয যুহদ—ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.), ইমাম আহমাদ (রহ.) প্রমুখের গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে। (৪)

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

যে বিষয় আকিদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে আমাদের দীনের অনুকূল হওয়ার কারণে গ্রহণ করা হয়েছে, সেটিকে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলা উচিত নয়। কেননা, সেটি ইসলামী দলিলের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে, ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে নয়। কাজেই তাকে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলার কোনো কারণ নেই। (৫)

দ্বিতীয় প্রকার

আমাদের দীনের অনুকূল:

এর উদাহরণ হলো—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُونٌ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

অনুবাদ:

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটিতে পরিণত হবে। জান্নাতবাসীদের মেহমানদারির জন্য মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সেটিকে নিজের হাতে এমনভাবে উল্টেপাল্টে করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফরের সময় রুটি উল্টেপাল্টে নেয়।’

এমন সময় একজন ইয়াহুদি এসে বলল, ‘হে আবুল কাসিম! কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মেহমানদারি সম্পর্কে আমি কি আপনাকে জানাব না?’

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’

সে বলল, ‘পৃথিবী একটি রুটিতে পরিণত হবে’, যেমন নবী ﷺ বলেছেন।

তখন নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশিত হলো। এরপর তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদের তাদের তরকারি সম্পর্কে জানাব না?’

তিনি বললেন, ‘তাদের তরকারি হবে বালাম ও নূন।’

সাহাবিগণ বললেন, ‘এগুলো কী?’

তিনি বললেন, ‘ষাঁড় ও মাছ। তাদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকে সত্তর হাজার মানুষ খেতে পারবে।’ (৬)

আমাদের দীনের খেলাফ:

এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—

আল্লাহ তাআলা কুরআনে জানিয়েছেন—

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

**“আর হারূন এর আগেই তাদের বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এর মাধ্যমে তো তোমাদের পরীক্ষা করা হয়েছে। আর তোমাদের রব পরম করুণাময়। তাই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মেনে চলো।’

তারা বলল, ‘আমরা এর ওপরই অবিচল থাকব, যতক্ষণ না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসেন।’”** (৭)

অথচ তাওরাত পাঠ করলে দেখা যায়, সেখানে হারূন (আ.)-কে বাছুরপূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তাঁকেই বাছুরপূজার দিকে আহ্বানকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুকূল বা সাংঘর্ষিক—কোনোটিই নয়:

এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের দীনে কোনো বক্তব্য নেই এবং সেগুলো আমাদের দীনের অনুকূলও নয়, আবার পরিপন্থীও নয়।

যেমন—কোনো ঘটনা, কোনো ঘটনার বিভিন্ন চরিত্রের নাম কিংবা কোনো সংখ্যার বিবরণ। যেমন, মিসরের আজিজের স্ত্রীর নাম কি 'যুলাইখা' ছিল? সাবার রানির নাম কি 'বিলকিস' ছিল? ইত্যাদি।

এ ধরনের বিষয়েই তাফসিরের গ্রন্থগুলোতে ইসরাঈলিয়াতের উল্লেখ বেশি দেখা যায়। মূলত এখানেই ইখতিলাফের ক্ষেত্র বেশি। কারণ, আকিদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও অনুকূল দলিল ছাড়া কোনো বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি

যদি এমন কোনো কথা বর্ণিত হয়, যা আমাদের দীনে উল্লেখ করা হয়নি এবং আমাদের দীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়; কিন্তু তা সুস্থ বিবেকের বিরোধী হয়, তাহলে তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। (৮)

যেমন, কল্পিত 'কাফ' (قاف) পর্বতের কথা। তারা বিশ্বাস করে, বিশাল একটি পাথর পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। এ ধরনের উপকথা কোনো কোনো মুসলিম ঐতিহাসিকও তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (৯)

তৃতীয় আলোচনা

আমরা দেখলাম, আকিদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। বরং এসব ক্ষেত্রে কোনো বিষয় গ্রহণ করা হলে তা ইসলামী দলিলের আলোকেই গ্রহণ করা হয়। তাই সেগুলোকে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলা উচিত নয়।

তবে ইতিহাস, ঘটনা, সংখ্যা, নাম ইত্যাদি বিষয়ে—যদি তা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়—বর্ণনা করার সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব বর্ণনা করা জায়েজ কি না? এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মূলত তিনটি মত পাওয়া যায়—

ক. কেউ কেউ বলেন, কোনো অবস্থাতেই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়েজ নেই।

খ. কেউ কেউ বলেন, এ বিষয়ে তাওয়াক্কুফ বা নীরব থাকাই উত্তম।

গ. আবার কেউ কেউ বলেন, যে বিষয়ে ইসলামে কোনো বক্তব্য নেই এবং যা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়; বরং ইসলামী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তা উপকারী হতে পারে—এমন বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ।

যারা না-জায়েজ বলেছেন বা নীরব থাকাকে উত্তম বলেছেন, তাঁদের দলিল

তাঁরা প্রথমে কুরআনের কয়েকটি আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তবে এসব আয়াত এ বিষয়ে সরিহ বা সুস্পষ্ট নয়। যেমন—

সুরা মায়েদা: ১৩; সুরা নিসা: ১৫৬–১৫৭; সুরা বাকারা: ৭৫, ৭৮, ১০১–১০৩, ১০৯, ১৩৯–১৪০; সুরা ইবরাহিম: ৭; সুরা কাহফ: ২২; সুরা ইসরা: ৩৬; সুরা হিজর: ৬।

তবে তাঁরা হাদিস থেকে কিছু সরিহ বা সুস্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا (اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا)

অনুবাদ:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে কিতাব ইবরানি ভাষায় তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলিমদের কাছে তা আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা আহলে কিতাবকে বিশ্বাসও করো না, অবিশ্বাসও করো না; বরং বলো, "আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে..."' (১০)

আরেকটি হাদিসে এসেছে—

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ وَقَالَ: أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

অনুবাদ:

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কোনো এক আহলে কিতাবের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি কিতাব নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি সেটি নবী ﷺ-এর সামনে পাঠ করলেন। এতে নবী ﷺ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন—

"হে ইবনুল খাত্তাব! তোমরা কি এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছ? সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের কাছে এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছি, যা

একেবারে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ। তোমরা তাদের কাছে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। কারণ, তারা যদি তোমাদের সত্য কথা বলে, তাহলে তোমরা তা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে পার; আর যদি মিথ্যা কথা বলে, তাহলে তোমরা তা সত্য বলে গ্রহণ করতে পার।

সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মূসা (আ.) যদি আজ জীবিত থাকতেন, তাহলেও আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় থাকত না।" (১১)

হাদিসটি দুর্বল হলেও একাধিক আসার ও বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। (১২)

সুবিধার জন্য তাহকিকটি নিচে দেওয়া হলো। তাহকিকটি করেছেন শায়েখ শরিফ হাতিম বিন আওনী সাহেব। (১৩)

আরেকটি আসারে এসেছে:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثُ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ لاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

"উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কীভাবে আহলে কিতাবকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করছ? অথচ তোমাদের কিতাব—যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে—তা অপেক্ষাকৃত নতুন। তোমরা এমন একটি কিতাব পড়ছ, যা সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্ভেজাল। এ কিতাব তোমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। তারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলেছে, এটি

আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে—যাতে এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে প্রশ্ন করতে নিষেধ করে না? আল্লাহর কসম! আমরা তাদের কাউকেই দেখিনি, যে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তোমাদের কাছে কোনো প্রশ্ন করেছে।'" (১৪)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন:

قال عبد الله: لا تسألوا أَهلَ الْكتابِ عن شيءٍ فإنَّهم لن يَهدوكم وقد ضَلُّوا أن تُكذِّبوا بحقٍّ أو تصدِّقوا بباطِلٍ

"আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন: 'তোমরা আহলে কিতাবের কাছে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ, তারা তোমাদের হেদায়াত করতে পারবে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে। ফলে তোমরা হয় সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, অথবা বাতিল বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করবে।'" (১৫)

যারা জায়েজ বলেছেন, তাঁদের দলিল

তাঁরা বলেন, আমরা ইতিপূর্বে এমন কিছু হাদিস ও আসার দেখেছি, যেখানে আহলে কিতাবদের থেকে বর্ণনা করা নিষেধ করা হয়েছে। এখন আমরা এমন কিছু সহিহ ও সুস্পষ্ট হাদিস ও আসার দেখব, যেখানে আহলে কিতাবদের থেকে বর্ণনা করা জায়েজ বলা হয়েছে। সুতরাং এখন আমাদের এমন ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে উভয় ধরনের হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

যেমন হাদিসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, তা যদি একটি আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা করো, এতে কোনো দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।’” (১৬)

এই হাদিসটি সহিহ। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আহলে কিতাবের কাছ থেকে বর্ণনা করা জায়েজ। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “وَحَدِّثُوْا”—অর্থাৎ, “বর্ণনা করো”। এর সঙ্গে যদি “وَلَا حَرَجَ”—“এতে কোনো দোষ নেই”—কথাটি না থাকত, তাহলে তা ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে আবর্তিত হতে পারত। কিন্তু “وَلَا حَرَجَ” কথাটি থাকার কারণে এটি কেবল জায়েজ হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে। (১৭)

অন্যদিকে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আহলে কিতাবের কাছ থেকে বর্ণনা করার নিষেধাজ্ঞার হাদিস পাওয়া যায়। পাশাপাশি তাঁর থেকে প্রচুর ইসরাঈলী বর্ণনাও পাওয়া যায়। ড. আব্দুর রহমান বিন আদিল মাশদ (হাফি.) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ৬৬৩টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। (১৮)

নমুনাস্বরূপ দেখুন: তাফসিরে তাবারি: ১৫/৫৬৩; তাফসিরে ইবনে কাসির: ৫/২৮৫।

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) তাঁর কিতাবে কা‘ব আল-আহবার থেকে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ১২টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। (১৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আহলে কিতাবের কাছ থেকে বর্ণনা করার নিষেধাজ্ঞার হাদিস আমরা দেখেছি। আবার তাঁর থেকেই ইসরাঈলীয়াতও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) কা‘ব আল-আহবার থেকে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ৭টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। (২০)

এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) যে কা'ব আল-আহবার ও আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) থেকে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত শুনতেন, সেটিও প্রমাণিত। (২১)

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসরাঈলি রেওয়াত মুতলাক বা সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা নিষেধ না। বরং শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ আছে। আর আমরা নিষিদ্ধ রেওয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এভাবে করব যে,

(শায়েখ শরিফ হাতিম লিখেছেন)

এসবের মধ্যে নিম্নোক্ত অর্থগুলোও অন্তর্ভুক্ত:

১. যে ব্যক্তি আহলে কিতাবের গ্রন্থগুলোকে ইসলামী শরিয়তের অন্যতম উৎস মনে করে সেগুলোর দিকে ফিরে যায়, অথচ ভুলে যায় বা জানে না যে, ইসলামের শরিয়ত দ্বারা সেগুলোর বিধান রহিত হয়ে গেছে। হজরত উমর (রাঃ)-এর হাদিসেও এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

"মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় থাকত না।"

২. যে ব্যক্তি এ ধারণা করে আহলে কিতাবের গ্রন্থগুলোর দিকে ফিরে যায় যে, ইসলাম সেগুলোর মুখাপেক্ষী এবং কুরআন-সুন্নাহ একাই ইসলামী আকিদা ও চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য আহলে কিতাবের গ্রন্থেরও প্রয়োজন রয়েছে। একই হাদিসের এ বক্তব্যে এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

"আমি তোমাদের কাছে এমন এক দ্বীন নিয়ে এসেছি, যা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল।"

৩. যে ব্যক্তি আহলে কিতাবের গ্রন্থগুলোর দিকে ফিরে গিয়ে সেগুলোর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী নয় এমন বিষয় ও বিরোধী বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে সে হয়তো সেসব গ্রন্থে বিকৃত হয়ে যাওয়া কোনো কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে বসবে, অথবা সেখানে থাকা কোনো অবিকৃত সত্য কথাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে। হাদিসের এ বক্তব্যটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে:

“তোমরা তাদের কাছে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ, তারা তোমাদের এমন কোনো সত্য কথা বলে দিতে পারে, ফলে তোমরা সেটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে; অথবা এমন কোনো বাতিল কথা বলে দিতে পারে, ফলে তোমরা সেটিকে সত্য বলে গ্রহণ করবে।”

৪. যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহকে বাদ দিয়ে আহলে কিতাবের গ্রন্থগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত ব্যক্তির তুলনায় এ ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞার অধিক উপযুক্ত; কারণ, এতে আকিদার সঙ্গে বিরোধিতার বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

৫. যখন আহলে কিতাবের গ্রন্থগুলোর দিকে ফিরে যাওয়া কোনো ব্যক্তির মধ্যে সন্দেহ, সংশয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং সেগুলো পড়ার কারণে—অথবা কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে এসব গ্রন্থের দিকে ফিরে যেতে দেখে—তার মনে কুমন্ত্রণা ও সংশয় প্রবেশ করে; আর এর কারণ হয় তার অজ্ঞতা ও দুর্বল ঈমান। এমন ব্যক্তির জন্য প্রথমে নিজের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা জরুরি। এরপর সে আহলে কিতাবের গ্রন্থগুলো পড়তে পারবে। হাদিসে ব্যবহৃত প্রশ্নবোধক ও ভর্ৎসনামূলক বক্তব্য—

“তোমরা কি এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছ?!”

—এর মাধ্যমে সম্ভবত এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ ধরনের আরও কিছু অর্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেগুলোর নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কীকরণের বিষয়টি নিঃসন্দেহ।

অতএব, আবারও আমরা এ সিদ্ধান্তে ফিরে আসি যে, আহলে কিতাবের কাছ থেকে কোনো বর্ণনা গ্রহণের বৈধতাকে এমন শর্তের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা জরুরি, যাতে উপরে উল্লিখিত কোনো অর্থ বা এ ধরনের অন্য কোনো ক্ষতিকর বিষয় বাস্তবায়িত না হয়। কারণ, এসব ক্ষতিকর বিষয় এমন কারণের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে আহলে কিতাবের বর্ণনা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়—যার কিছু বিষয় দ্বীনের অপরিহার্য জ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত এবং যার পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল ও শরিয়তের সামগ্রিক মূলনীতি বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১। কাসাসুল কুরআন: ১/৫১-৫২; ইসরাঈলিয়াত ফি কুতুবিত তাফসির ওয়াল হাদিস: ১৯-২০ পৃ.; ইসরাঈলিয়াত ওয়া আসারুহা ফি কুতুবিত তাফসির: ৭১-৭৫ পৃ।

২। সহিহ বুখারি: ৪৮১১ নং হাদিস।

৩। সহিহ বুখারি: ৪৫৫৬ নং হাদিস।

৪। মুফাসসিরুনা মিনাস সাহাবা: ২/৮৯৯-৯০০।

৫। কাসাসুল কুরআন: ১/৫৫-৫৬, ৫৮।

৬। সহিহ বুখারি: ৬৫২০ নং হাদিস।

৭। সুরা ত্বহা: ৯০-৯১ নং আয়াত।

৮। শরহে মুকাদ্দিমাতি ফি উসূলিত তাফসির: ১৫২ পৃ।

৯। কাসাসুল কুরআন: ১/৫৫।

১০। সহিহ বুখারি: ৪৪৮৫ নং হাদিস।

১১। মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬৩১, ১৫১৫৬ নং হাদিস; সুনানে দারিমি: ৪৪৭ নং হাদিস।

১২। ফাতহুল বারি: ১৩/৫৩৫।

১৩।

فقد أخرجه الإمام أحمد (رقم14631، 15156) ، والدارمي في مسنده –دار التأصيل –(رقم 447) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن عمر ، والتضعيف لمجالد والكلام فيه شهير.

وهذه الرواية هي أرجح أوجه الحديث عندي التي من حديث الشعبي.

وأخرجه الإمام أحمد (رقم 15864، 18335) ، من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت . والكلام في جابر بن يزيد الجعفي مشهور ، والخلاف فيه معلوم ، فضلا عن الاضطراب الذي وقع له فيه.

وقد قال البخاري عن هذا الوجه : «لم يصح» ، كما في التاريخ الكبير (5/ 39) ، ووصفه ابن عبد البر في الاستيعاب بالاضطراب. (3/ 875)

وانظر بعض الاضطراب في هذين الوجهين عند ابن منده في معرفة الصحابة –ترجمة ثابت بن يزيد –(1/ 356) ، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم –ترجمة عبد الله بن ثابت –(3/ 1600- 1601 رقم الحديث 4030) . وقد تكلم عن اختلاف طرقه الدارقطني في العلل (رقم140).

ومع هذا الاضطراب ، فإن هذا الوجه يفيد في إثبات أن للحديث أصلا من حديث الشعبي.

وأظن صوابَ هذا الإسناد (روايةِ جابر الجعفي) هو الروايةَ الآتية ، وأن جابرًا الجعفي سمع في قصة الحديث ذِكرًا لعبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رؤيا الأذان ، فنسي ، كما هي عادته، وجعله أولا : (عبد الله بن ثابت) لا (عبد الله بن زيد) ، وجعله ثانيا : في إسناد الحديث ، وهو إنما ذُكر في قصة الحديث.

فقد أخرج الطبراني في الكبير هذا الحديث من وجه آخر نافع جدا في تقوية الحديث ، وهو في الجزء المفقود من المعجم الكبير ، لكن ساق ابنُ كثير إسناده ومتنه منه تامّين في كتابه (جامع المسانيد والسنن) ، فالحمد لله ، فقال : «قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة : حدثنا منجاب بن الحارث : حدثنا أبو عامر

[الأسدي] ، عن أبى إسحاق ، عن أبى حبيبة ، عن أبى الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة. فقال: يا رسول الله، أخذتها من أخ لى من بنى زريق . فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عبد الله بن زيد - الذى أُري النداء- : أمسخ الله عقلك ؟! ألا ترى الذى بوجه رسول الله –(صلى الله عليه وسلم) ؟! فقال عمر: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وبالقرآن إمامًا، فَسُرِّيَ عن وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثم قال: «والذى نفس محمد بيده ! لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتّباعي، ثم لو كان بين أظهركم ثم تبعتموه لضللتم ضلالاً بعيدًا. أنتم حظى من الأمم، وأنا حظكم من الأنبياء» ، جامع المسانيد والسنن لابن كثير (9/ 344 رقم 12012).

وهذا إسناد قريب من القبول ، فأبو حبيبة الطائي : وإن انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السَّبيعي، فقد صحح له الترمذي ، وأخرج له أبو داود ، واحتج به النسائي ، وصحح له ابن حبان والحاكم ، ولم يجرحه أحد ، مع علو طبقته ، وهذا كاف لتوثيقه.

وأما أبو عامر الأسدي : فقد تحرف في مطبوع كتاب ابن كثير (جامع المسانيد) إلى (أبي عامر العَقَدِي) ، وأبو عامر العقدي لم يدرك أبا إسحاق السَّبيعي ، كما أن الهيثمي قد علق على هذا الحديث في مجمع الزوائد بقوله : «وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي : ولم أرَ من ترجمه» ، مجمع الزوائد –تحقيق : حسين سليم أسد – (رقم819).

وأبو عامر القاسم بن محمد بن واصل بن أبي حرة الأسدي الكوفي : ترجم له البخاري في الكبير (164/7) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (119/7رقم680) ، بلا جرح أو تعديل . لكن اعتمد محمد بن عثمان ابن أبي شيبة على نقله في مسائله في الجرح والتعديل (رقم 23، 39) ، وخَرّج العقيليُّ له حديثًا في ترجمة معروف بن خَرَّبُوذ –تحقيق : السرساوي –(74/6)، فحمّلَ العقيليُّ نكارةَ الحديث معروفًا ، في حين لم يترجم لأبي عامر الأسدي ، مما يعني أنه عنده ممن لا يتحمل تبعة رواية مثل تلك المنكرات . وخرج له الحاكم في المستدرك (رقم2551) ، والضياء في المختارة –مسند ابن عباس –(269/10-270 رقم280).

ومع ذلك فقد توبع أبو عامر الأسدي عليه ، وصُحِّح الحديث ،

فمن هذا الوجه خاصة قد صححه ابن حبان مختصرا ، حيث أخرجه من طريق زيد بن الحباب قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حبيبة الطائي ، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا حظكم من الأنبياء ، وأنتم حظي من الأمم» . التقاسيم والأنواع –دار ابن حزم –(رقم3545).

ولما أخرجه البزار من هذا الوجه (رقم 4092) ، قال عقبه : « وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا أبو الدرداء ، ولا نعلم رواه عن أبي الدرداء إلا أبو حبيبة ، ولا عن أبي حبيبة إلا أبو إسحاق ، ولا عن أبي إسحاق إلا الثوري ، ولا عن الثوري إلا زيد ، ولا عن زيد إلا أبو كريب ، ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث. «

قلت : أما من حديث أبي الدرداء فالتَّفَرُّدُ على ما قال البزار ، أما من حديث أبي الدرداء عن قصة عمر : فقد سبقت متابعةُ الثوري عليه.

فإذا أضيفت إلى هذه الوجوه أيضا مراسيلُ أخرى تشهد للحديث : يَقْوَى القولُ بثبوته.

ومن هذه المراسيل:

•مرسل أبي قلابة الجرمي عن عمر رضي الله عنه ، يصح إلى أبي قلابة : أخرجه أبو داود في المراسيل – تحقيق : د/ عبد الله الزهراني - (رقم 449) ، وعبد الرزاق في المصنف –دار التأصيل - (رقم 10902، 20979).

•مرسل الحسن البصري عن عمر رضي الله عنه ، يصح إلى الحسن : أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (29/3) ، وابن الضُّريس في فضائل القرآن (رقم 89) ، ومن طريق أبي عبيد أخرجه البيهقي في الشعب (رقم175) ، وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (رقم1488).

وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم1367) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (8/4) ، من طريق محمد بن يونس عن شعيب بن بيان الصفار عن شعبة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه ، وهذا إسناد متصل ، لكنه لا يصح ، وبلاؤه من محمد بن يونس الكديمي ، فهو متهم بالكذب ، كما أن شعيب بن بيان ضعيف : ضعفه البزار كما في مسنده (رقم 7267) والجوزجاني والعقيلي (كما في ترجمته في التهذيب).

وفي هذين المرسلين الثابتين عمن أرسلهما (وهما أبو قلابة والحسن) تكرر اللفظ الغريب في هذا الخبر ، وهو لفظ «التهوُّك» ، مما يُقَوّي شهادتهما لصحة الحديث ، وأن للحديث بقصته وبلفظه المستغرب هذا الذي يقلُّ استعماله أصلًا ثابتًا عن النبي (صلى الله عليه وسلم).

১৪। সহিহ বুখারি: ৭৩৬৩ নং হাদিস।

১৫। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ১০১৬২; মু'জামুল তাবারানি: ৯৭৫৯; ফাতহুল বারি: ১৩/৩৩৪।

১৬। সহিহ বুখারি: ৩৪৬১ নং হাদিস।

১৭। শরহে মাসাবিহুস সুন্নাহ: ১/১৯৬।

১৮। মুফাসসিরুনা মিনাস সাহাবা: ২/৮৯৯।

১৯। নুযহাতুস সামিয়ীন ফি রেওয়াতিস সাহাবা আনিত তাবেঈন: ৮৯–৯৪, ১০৬–১০৯।

২০। নুযহাতুস সামেয়ীন: ৮১–৮২।

২১। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক: ২৯১ নং হাদিস; মুসনাদে আহমাদ: ৭৭১৪, ২৩৭৯১, ১০৩০৩, ২৩৭৯১; সুনানে আবি দাউদ: ১০৪৬; সুনানে তিরমিজি: ৪৯১; তারিখে দিমাশক: ৬৭/৩৫৯; ফাতহুল বারি—লি ইবনে রজব: ৩/৪১০।